বিবেকানন্দ

আজকের প্রেক্ষিতে ‘কর্মে পরিণত বেদান্ত’-র প্রয়োগ

স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ

[এই প্রবন্ধটি গত ১৩ জুলাই, ২০০৭ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কে প্রদত্ত বক্তৃতার পরিমার্জিত রূপ। মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন **সুমনা সাহা**।]

স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার—আদর করে স্বামীজী যাঁকে ‘কিডি’ বলে ডাকতেন। তামিল ভাষায় ‘কিডি’ শব্দের অর্থ টিয়াপাখি বা পাখির মতো স্বল্পাহারী যে। তিনি তৎকালীন মাদ্রাজের একটি বিখ্যাত কলেজে গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। প্রথম জীবনে তিনি প্রায় নাস্তিক ছিলেন। একবার তিনি স্বামীজীকে চ্যালেঞ্জ করলেন। স্বামীজী কিডিকে নিজের খুব কাছে আসতে নিষেধ করেছিলেন। কিডি বললেন, ‘‘আপনি কি স্পর্শের দ্বারা আমার মনোভাব পরিবর্তিত করতে পারেন?’’ উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, ‘‘কিডি, সাবধান! সেই চেষ্টা তুমি কোরো না!’’ কিন্তু সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করে কিডি তাঁকে স্পর্শ করলেন এবং এমনভাবে রূপান্তরিত হলেন যে, গৃহী থেকে প্রায় এক সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেন। উচ্চ এক আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে সদা বিচরণ করতে লাগলেন তিনি।

স্পর্শমাত্রই আমূল রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা স্বামী বিবেকানন্দের ছিল। সেই ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা প্রয়োগ করতেন না। পাশ্চাত্যে বক্তৃতাকালে, কেবল ইচ্ছাশক্তিবলে তিনি হাজার হাজার নরনারীর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। তিনি নিজেও সেটা জানতেন। এইরকম একটি ঘটনার কথা জানা গেছে, যখন তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁর মধ্য থেকে এমন শক্তির বিচ্ছুরণ হচ্ছিল যে, সেখানে উপস্থিত সহস্রাধিক শ্রোতার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে তারা অতি উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। হঠাৎ স্বামীজী বক্তৃতা-মঞ্চ ত্যাগ করে চলে গেলেন। অনেকে

ভাবলেন, তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। কেউ কেউ মনে করলেন, হয়তো স্বামীজী তাঁর মুখস্থ করে আসা বক্তৃতা মাঝপথে ভুলে গেছেন। কিন্তু স্বামীজী সম্পর্কে তাঁরা খুব বেশি জানতেন না। স্বামীজী জীবনে কোনওদিন বক্তৃতা আগে থেকে তৈরি করে রাখতেন না। এমনকী, বক্তৃতার সময়ও তিনি কোনও 'নোটস্'-এর সাহায্য নিতেন না। পরে যখন কেউ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''স্বামীজী, আপনি সেদিন হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে চলে গেলেন কেন?'' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ''দেখুন, আমি অনুভব করলাম, আমার ভিতর থেকে যেন একটা শক্তি প্রবল বেগে বেরিয়ে আসতে চাইছে—যা দিয়ে আমি মুহূর্তে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর চেতনায় রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক মুক্তি প্রদান করতে পারতাম। কিন্তু আমার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাতে সায় দেয়নি। বেদান্ত মতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মানুসারে নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে হবে।''

এইরকম শক্তিধর ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো থেকে ৩ মার্চ ১৮৯৪ কিডিকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী কয়েকটি গভীর তাৎপর্যবাহী মন্তব্য করেছেন। এই চিঠিতেই শিক্ষা ও ধর্ম সংক্রান্ত স্বামীজীর দুটি বিখ্যাত ও বহুল-উদ্ধৃত উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় : ''মানুষের সদা বিদ্যমান অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশই শিক্ষা'' এবং ''মানুষের সদা বিদ্যমান অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম।'' এই চিঠিতেই অদ্বৈত বৈদান্তিক আদর্শভিত্তিক ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ''অদ্বৈতই হতে চলেছে আগামী প্রজন্মের চিন্তাশীল মানুষের ধর্ম।''

দ্বিতীয় যে-চিঠিটির উল্লেখ করা যায়, সেটি তিনি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখেন। সেই চিঠিতে স্বামীজী লেখেন, ''গত সন্ধ্যার দীর্ঘ 'রবিবাসরীয় গণ-বক্তৃতা'র পরে, এই যে তোমায় আমি লিখছি, ঠিক এই মুহূর্তে আমার শরীরের প্রত্যেকটা হাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। তাহলেই বোঝ, হিন্দু ভাবগুলি ইংরাজিতে বুঝিয়ে বলা, তারপরে শুষ্ক দর্শন, আজগুবি পুরাণ ও অদ্ভুত-কিম্ভুত মনস্তত্ত্বের মধ্য থেকে এমন একটি ধর্ম খুঁজে বের করা, যা হবে সহজ, সরল, জনপ্রিয় এবং সেইসঙ্গে উচ্চ-চিন্তাশীল মনেরও খোরাক জোগাবে—এ যে কত কঠিন কাজ, তা যে চেষ্টা করেছে, সেই বুঝবে। নীরস ও বিমূর্ত অদ্বৈতকে জীবন্ত ও কাব্যিক করে তাকে নিয়ে আসতে হবে প্রাত্যহিক জীবনচর্যায়, পুরাণের অপ্রয়োজনীয় ও আজগুবি গল্পগুলির মধ্য থেকে তুলে আনতে হবে দৃঢ় নৈতিক আদর্শ; বিভ্রান্তিকর যোগীবাদের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হবে—এবং সেগুলি সবই এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যেন একটি শিশুও ধারণা করতে পারে। এই হল আমার জীবন-ব্রত। আমি কতদূর সফল হব, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।''

এটি স্বামীজীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য—যেখানে স্বামীজী নিজেই তাঁর পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য এবং তাঁর 'জীবন-ব্রত' সম্বন্ধে বলছেন। শব্দগুলি লক্ষণীয়—''শুষ্ক, নীরস অদ্বৈতকে করে তুলতে হবে প্রাণবন্ত ও কাব্যিক—যা মূর্ত হয়ে উঠবে প্রাত্যহিক জীবনে...''; এই হল 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'-এর সারকথা—যা স্বামীজী তাঁর অনবদ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

বেদান্তের অর্থ 'ঔপনিষদিক প্রজ্ঞা'—একে আমরা পাই বেদের একেবারে অন্তে—'বেদান্তে', অন্ত কথার অর্থ হল শেষ। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই বৈদান্তিক প্রজ্ঞা কীভাবে বাস্তবসম্মত (practical) হতে পারে? অবশ্যই আমাদের সকলের বেদান্তকে এক বিমূর্ত তত্ত্ব বলেই মনে হয়। বেদান্তকে বিমূর্ত

তত্ত্ব বলে মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই আধুনিক পৃথিবীতে আমরা যখন 'বাস্তবতা' নিয়ে কথা বলি, তখন সর্বত্র যে-উন্মত্ত প্রতিযোগিতার দৌড় চলছে, তাতে সাফল্য লাভ করা বা জীবনে সফল হওয়াকেই বোঝাতে চাই! জীবনে সফল হতে গেলে কীভাবে একটা 'কেউকেটা' হতে হবে, কীভাবে বেশি অর্থ উপার্জন করা যাবে—এগুলিই আজকের এই বস্তুতান্ত্রিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং, কিছু অর্জন করা, প্রতিযোগিতায় জিতে যাওয়া বা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা—এগুলিকেই আমরা আধুনিক জীবনের 'বাস্তবতা' বলে থাকি। স্বামীজী তাঁর দুটি বিখ্যাত বক্তৃতায় এই বিষয় নিয়ে বলেছেন যা 'মদীয় আচার্যদেব' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম বক্তৃতাটি আমেরিকায় এবং দ্বিতীয়টি ইংল্যান্ডে দেওয়া বক্তৃতার অংশ। সেখানে পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''বাস্তবতা সম্বন্ধে তোমাদের ধারণার সঙ্গে আমার দেশের ধারণা মেলে না। তোমরা মনে কর, ঈশ্বর, আত্মা বা অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যন্ত অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু ভারতে গিয়ে তুমি যদি বল, 'এসো, জগৎ উপভোগ করো, আমি তোমাদের জগতের সেরা ভোগের বস্তু দেব', তোমার সামনে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ যদি বল যে, 'যাও, দূরের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বাকি জীবনটা তোমার নাকের ডগায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কাটিয়ে দাও, তাতে তুমি মুক্তি লাভ করবে'—তখন শত শত মানুষ অন্ন, বস্ত্র ও তোমার প্রয়োজনের সমস্ত সামগ্রী নিয়ে তোমাকে অনুসরণ করবে। আমাদের 'বাস্তবতা' হল এই ধরনের। আত্মা বা ঈশ্বর সংক্রান্ত যা কিছু অন্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে আমরা জীবনের অত্যন্ত বাস্তব বিষয় বলে গণ্য করি এবং এমনকী মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলেও তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে চাই। আর তোমরাও তোমাদের ভাবে 'বাস্তবসম্মত'। ধরো, পাশ্চাত্যে কেউ বলল যে, 'আমি পর্বতশিখরে বসে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকতে চাই এবং ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করতে চাই'—দেখবে সব দরজা তোমাদের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকী এর জন্য তোমাদের জেলে পর্যন্ত যেতে হতে পারে। কিন্তু, তুমি যদি বল, 'আমি জগৎটাকে ভোগ করতে চাই', তাহলে হাজারটা সুযোগ পাবে। সেটা তোমাদের কাছে বাস্তবতা। আমাদের কাছে কিন্তু অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় সবকিছুই বাস্তব।"

অতএব, 'বাস্তবতা' শব্দটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর একটি শব্দ, কারণ আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতা বলতে আমরা যা বুঝি, আর স্বামীজী বাস্তবতা বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন—দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শেখাই—'বাস্তববাদী হও', 'বুঝদার হও', 'আরও অর্থ রোজগার করো', 'আরও বেশি রোজগারের চেষ্টা করো।' এই হল আমাদের আধুনিক যুগের বাস্তবতার সর্বস্ব এবং এই তথাকথিত 'বাস্তববাদী জীবনযাপনের' শেষে আমরা হতাশাবাদী হয়ে উঠি। ঠিক আছে, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও এর বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলতেন, ''দেখো, ভারতবর্ষ প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদেশি শাসকদলের দাসত্ব করেছে। সুতরাং তারা স্বাধীন হয়ে না হয় কিছুটা ভোগ করুক। তিনি কিছুটা আনন্দ বা ভোগ করার বিরুদ্ধে ছিলেন না। আরও বেশি খাদ্যের সংস্থান, রোজগারের আরও সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সর্বদাই জোর দিতেন। সেটা প্রয়োজন। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, এটাই কি জীবনে সব? আমাদের অস্তিত্ব, জীবন ও তার অর্থ সংক্রান্ত মূল প্রশ্নগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মনে উদিত হবেই, যদি না সে সম্পূর্ণ পশুস্তরে নেমে যায়, আপনি-আমি যেটা কখনই

হতে পারব না। জীবন সম্পর্কে, অস্তিত্ব সম্পর্কে, কিছু মৌলিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন আপনার মনে উঠে আসতে বাধ্য—আমি এখানে কেন এলাম? মানুষের অন্তিম গন্তব্য কোথায়? মৃত্যুর পরে আমি কোথায় যাব? মৃত্যুর পরেও কি জীবনের অস্তিত্ব আছে? ঈশ্বর কি আছেন? আমার জীবনের লক্ষ্য কী? অবশ্য আপনি এই প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যেতে পারেন। কিন্তু প্রশ্নগুলি বারবার ফিরে আসবে আর আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। মানুষ, অর্থাৎ 'বাস্তববাদী মানুষ' আপনাকে বলবেন, এই বিষয়গুলি নিয়ে বুড়ো বয়সে ভাবলেও চলবে। তার মানে, যখন আপনি বুড়ো হবেন, আর আপনার চুল সাদা হয়ে যাবে, আপনার সবকটা দাঁত পড়ে যাবে, যখন আপনি ভাল করে হাঁটতেও পারবেন না—তখন আপনার গীতা ও উপনিষদের প্রয়োজন হবে, কিন্তু এখন নয়! এখনও আপনার সময় হয়নি! আপনি ধর্মীয় বক্তৃতা শোনার পক্ষে এখনও যথেষ্ট তরুণ!

যদিও বিবেকানন্দ হয়তো বলবেন, যখন আপনি বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়বেন, তখন নয়, ধর্মীয় বক্তৃতা শোনার এখনই আপনার উপযুক্ত সময়। যখন আপনার দেহে সিংহতুল্য শক্তি থাকবে, কেবল তখনই আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। সমস্ত বাস্তবতার থেকেও সূক্ষ্মতম অন্তর্জগতের রহস্য ভেদ করতে না জানি কতটা সামর্থ্যের প্রয়োজন! যে সকল মুনিঋষি একাজ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই তা জানবেন। স্বামীজী বলেছেন, হাজার হাজার বছর ধরে এই বেদান্ত ছিল অরণ্যে, পর্বতে ও গুহায়। এই প্রজ্ঞাকে গুহা ও অরণ্যের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনা এবং প্রচারের দ্বারা সমগ্র জগদ্‌বাসীর মধ্যে তা বিতরণ করা—এটাই ছিল তাঁর নরেনের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ।

স্বামীজী দুটি জিনিস করলেন। প্রথমত, তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, পরম সত্য বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা সময় নেই। উদাহরণ হিসাবে, যেমন আমরা বলে থাকি, সর্বত্র কিংবা যে কোনও স্থানে উপনিষদ আলোচনা করা যাবে না। এই ধরনের পঠন-পাঠনের জন্য দরকার পবিত্র স্থান, প্রয়োজন একটি অত্যন্ত উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু আজ আমরা এই বাতানুকূল কক্ষে উপনিষদ আলোচনা করছি, এতে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কেবল যে নাসিকা কুঞ্চিত করবেন, তাই নয়, মনে আঘাত পেতেও পারেন। কী? কলকাতার এক বাতানুকূল কক্ষে উপনিষদের আলোচনা? অর্থাৎ বিবেকানন্দ এটাই করলেন, দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি দূর করলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি বৈদান্তিক প্রজ্ঞার অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। আপনারা জানেন, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে 'অধিকারবাদ' একটি বিখ্যাত মতবাদ। অবশ্যই এর একটি অর্থ আছে। যিশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, ''সকলের উদ্দেশে মুক্তো ছড়িয়ো না।'' অর্থাৎ, যারা এর মর্ম বুঝবে না, তাদেরকে এসব বোলো না। কিন্তু স্বামীজী বললেন, এই বৈদান্তিক চিন্তা সকলের জন্য অবাধ হওয়া উচিত। স্বামীজীর ভাষায়, যাঁরা একে তাঁদের অধিকার বা জন্মগত অধিকার বলে মনে করবেন, তাঁরা একে গ্রহণ করবেন। এখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে এমনকী তাঁর নিজের গুরুদেবেরও আপাত বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের নিজে বাছাই করে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি সকলকে সবকিছু দেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উচ্চতম অদ্বৈত জ্ঞান স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে অন্য কাউকে দেননি। কারণ তাঁর বিবেচনায় স্বামীজীই ছিলেন অদ্বৈত জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী। তিনি নরেনকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন, সাবধানে দরজা বন্ধ করতেন, তারপর তাঁর বালিশের নিচ থেকে বের করতেন অদ্বৈত

বেদান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অষ্টাবক্র সংহিতা' আর বলতেন, ''নরেন, আমাকে এই বইটা একটু পড়ে শোনাবি?'' নরেন তখন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন, তিনি কয়েকটি লাইন পড়ার পরেই বলতেন, ''না, এই বই আমি পড়ব না, চিমটে দিয়েও কখনো তুলে দেখব না। আমার কাছে একথা বলা তো ঘোর নাস্তিকতার সমান— আমি ভগবান, আমিই ব্রহ্ম। যে সমস্ত মুনিঋষিরা এইসব কথা লিখেছেন, তাঁদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা পাগল।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথা শুনে বলতেন, ''ওরে, তুই তাঁদের মত নাই বা নিলি, তাই বলে ঋষিদের গালমন্দ করছিস কেন? দেখ, আমি তো মুখ্যু, আমি সংস্কৃত পড়তে পারি না। তুই আমার জন্য পড়ে দে।'' সুতরাং, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথকে দিনের পর দিন, বারবার সেই বই পড়তে হত, যতদিন না অদ্বৈত জ্ঞান তাঁর চেতনায় স্থায়ীভাবে প্রোথিত হয় এবং তাঁকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উচ্চতম অদ্বৈত অনুভূতি দিয়েছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ, যিনি কিনা তখন বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন যে, তিনিই স্বয়ং পরম সত্তা, বা ব্রহ্ম, সেই তিনিই যখন পাশ্চাত্যে গেলেন, প্রচার-মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সকলের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''মানব সত্তার গৌরব, মহিমা কখনও বিস্মৃত হয়ো না। (নিজের হৃদয় স্পর্শ করে বলেছিলেন) বুদ্ধ ও যিশু 'আমি' রূপ অনন্ত চৈতন্য মহাসাগরের কেবল এক একটি তরঙ্গ মাত্র।''

তাঁর এই উক্তি অষ্টাবক্র সংহিতার ঋষি যে-ভাব নিয়ে সগর্ব ঘোষণা করেন, তার সঙ্গে একই সুরে বাঁধা : ''ময্যানন্তমহাম্বোধি...উদ্যন্তি ঘ্নন্তি, খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ।'' (২।২৫)

অর্থাৎ, আমিই চৈতন্যের সেই অনন্ত মহাসাগর। জীব ও জগদ্‌রূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এখানে উত্থিত হয়ে চলেছে, কিছুক্ষণের জন্য খেলা করছে ও আবার এরই মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল তাঁকেই এই উপদেশ দিয়েছিলেন, রাখাল (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতিকেও দেননি। এক জায়গায় স্বামীজী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ''কোনও এক বিশেষ কারণে প্রভু (শ্রীরামকৃষ্ণ) আর কাউকে অদ্বৈত তত্ত্ব শিক্ষা দেননি। কিন্তু 'তিনি' আমাকে তা দিয়েছেন।'' এখন প্রশ্ন হল, যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের থেকে আলাদাভাবে অদ্বৈত তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, সেই বিবেকানন্দ কেন অদ্বৈত জ্ঞান সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন? এর কারণ কী? তাহলে কি তিনি প্রভুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেন? তিনি কি প্রভুর ইচ্ছার অন্যথা করেছিলেন? এই প্রশ্ন স্বামীজীকেও করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক শিষ্যের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ-আলোচনার একটি অপ্রকাশিত নথি রয়েছে। স্বামী ধীরেশানন্দ এই বাক্যালাপের উদ্ধৃতি দিয়েছেন উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে। সেখানে আমরা পাই যে, স্বামীজীর সর্বসাধারণের জন্য অদ্বৈতবাদের এই প্রচার যুক্তিসংগত কি না, বিশেষত তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই ব্যাপারে এতটা বাছবিচার করেছেন, এই বিষয়ে শিষ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজীর জবাব ছিল সরল ও সোজাসাপটা। তিনি বলেছিলেন যে, মানুষকে দেখামাত্রই তার সুপ্ত শক্তি ও যোগ্যতা যাচাই করার দুর্লভ ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। ''কিন্তু এইরকম বাছবিচার করার সময় আমার ছিল না। আমি সকলকে সেই বিদ্যা দান করেছি। যে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি, সে এই উপদেশের মর্ম গ্রহণ করতে পারবে।'' স্বামীজী আরও বলেন, ''দ্বিতীয়ত এই অদ্বৈত জ্ঞান এমন এক রত্ন যে, তা কেবল মানুষের মঙ্গলই করবে, কখনও তা কারও অনিষ্ট করবে না। অতএব, যে চায়, তাকেই এই জ্ঞান দেওয়া হোক।''

এই হল স্বামীজীর হৃদয়, বুদ্ধের হৃদয় বা মহান আচার্য রামানুজের হৃদয়ের সঙ্গে যার তুলনা চলে! রামানুজের জীবনকাহিনি নিশ্চয় জানেন আপনারা। মন্ত্রদানের পূর্বে তাঁর গুরু তাঁকে বললেন, ''দেখো, আমি তোমাকে অত্যন্ত পবিত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র দেব। কাউকে এটা বোলো না।'' রামানুজ জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেন? বললে কী হবে?'' তখন তাঁর গুরু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ''তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করতে চাও? যদি এই মন্ত্র তুমি অন্য কাউকে বল, সেই ব্যক্তি অবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে আর তুমি গুরুবাক্য লঙ্ঘনের জন্য নরকে যাবে।'' রামানুজ কী করেছিলেন? তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে সকলকে ডেকে বলতে লাগলেন, ''তোমরা সকলে ছুটে এসো, আমি তোমাদের একটি মহাপবিত্র মন্ত্র দেব। তোমরা সবাই মুক্ত হয়ে যাবে, আর আমি তখন খুশিমনে নরকে যাব।'' এই হল সেই ঋষির হৃদয়! এই গল্পটি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা 'রামানুজ চরিত্র' দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণও মহানন্দে স্টার থিয়েটারে গিয়েছিলেন। স্বামীজীও এইরকমই হৃদয়বান ছিলেন! মনে রাখতে হবে, আমি বা আপনারা কেউই এই সভাকক্ষে বসে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করতে পারতাম না, যদি স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে এর প্রচার করে সকলের মধ্যে উদারভাবে একে বিতরণ না করতেন। সুতরাং আমরা এই মহাপ্রাণের প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ যিনি বনে-জঙ্গলে ও গিরিগুহায় লুকিয়ে থাকা বেদান্তকে বাইরে বের করে এনে আমাকে, আপনাকে সকলকে বিলিয়ে দিয়েছেন—আমরা, যারা কিনা বেদান্ত চর্চার নিম্নতম অধিকারী! স্বামীজী একথা জানতেন বটে, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, এই জ্ঞানভাণ্ডার সকলের জন্য অবাধে উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ এই জ্ঞান কারও ক্ষতি করে না, বরং তা মানুষকে অনন্তের স্বাদ দেবে। যত সামান্য পরিমাণেই আমরা চর্চা করি না কেন, তা আমাদের উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করবে, যেমন ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' অর্থাৎ এই ধর্মের কিছুমাত্র চর্চাও মহৎ ভয় থেকে উদ্ধার করে।

দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় বা দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দুধর্মের শক্তি তথা আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে স্বামীজী সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নিজেই বলেছিলেন, ''জগতের কোনও ধর্মই যেমন মনুষ্যত্বের গরিমা বিষয়ে হিন্দুধর্মের মতো এমন উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেনি, তেমনই জগতের অন্য কোনও ধর্মই সমাজের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির মানুষকে এমনভাবে পদদলিতও করেনি যেমনটা হিন্দুধর্মে করা হয়েছে। কিন্তু কেন? স্বামীজী বলছেন, এর জন্য ধর্ম দায়ী নয়। তাঁর উক্তিটি লক্ষণীয়। তিনি বললেন, ''বন্ধুগণ, শুনুন, ঈশ্বরের কৃপায় আমি এর রহস্য আবিষ্কার করেছি।'' কী সেই রহস্য?—''এর জন্য ধর্ম দায়ী নয়।'' হিন্দুধর্মের ধর্মধ্বজী ও তথাকথিত ধার্মিকরা, যারা ধর্মীয় মতবাদকে নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যবহার করেছে, তারাই এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী। হিন্দুধর্ম থেকে যদি এই পুরোহিততন্ত্র বাদ দেওয়া যায়, তাহলে আমরা পৃথিবীর অন্যতম মহত্তম ধর্ম পেতে পারি। এই ছিল তাঁর মন্তব্য এবং এর থেকে প্রকাশ পায় যে, আমরাও যথেষ্ট উন্নত! কয়েকটি অসাধারণ মতবাদ এবং অত্যাশ্চর্য সত্যের সবগুলিই বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমাদের উপনিষদে নথিভুক্ত আছে, যেমন—ব্রহ্মবিষয়ক সত্য, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, মানুষের চরম পরিণতি ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ মানুষ 'রহস্য বিদ্যা' বা 'গুপ্ত বিদ্যা'র তকমা দিয়ে এই ঔপনিষদিক প্রজ্ঞাকে দূরে রেখেছে এই বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যে, উপনিষদের অর্থ রহস্য, তাই সকলকে এই ঔপনিষদিক জ্ঞান দান করা উচিত নয়। ফলে, কেবলমাত্র সংসারত্যাগী অরণ্য বা

গুহাবাসী সন্ন্যাসীরাই সমাজ-সংসারের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে, নিশ্চিন্তে উপনিষদ পাঠ করতেন।

স্বামীজী এই অবস্থা পরিবর্তনের উপায় বের করলেন। তিনি বললেন, তিনি এই সম্পদ সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন, তা সে মাদ্রাজ কিংবা কলকাতা কিংবা পৃথিবীর যে কোনও শহরের মানুষই হোক না কেন। স্বামীজী বললেন যে, বাস্তবসম্মত করে তুলতে হবে এই ঔপনিষদিক প্রজ্ঞাকে, যে-তত্ত্বগুলি আমরা উপনিষদে পাই সেগুলিকে। তাই তিনি উপনিষদগুলির মধ্য থেকে কিছু মূল তত্ত্ব চয়ন করলেন এবং আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শরূপে তুলে ধরলেন। সেই আদর্শটি হল—'তত্ত্বমসি', অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্মবস্তু, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই হল বেদান্তের সার। চুলচেরা বিচার এবং সকল প্রকার বৌদ্ধিক কসরতের শেষে আমরা জানতে পারি যে, মানবাত্মা পবিত্র ও সর্বজ্ঞ। আত্মার সাপেক্ষে দেখলে জন্ম ও মৃত্যু কেবল কুসংস্কার, সম্পূর্ণ আজগুবি ব্যাপার। নিজ আত্মার গৌরবে বিশ্বাস না থাকার অর্থ, বেদান্তের ভাষায় নাস্তিকতা। স্বামী বিবেকানন্দ উপদিষ্ট বাস্তবসম্মত বা কর্মে পরিণত বেদান্তের এটি একটি অত্যন্ত মৌলিক দিক। আমরা উপনিষদের মহাবাক্যগুলির তৎকালীন যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি ব্যাখ্যা পাই। কিন্তু স্বামীজী সেই সমস্ত যুক্তির কচকচি ছেড়ে দিতে বললেন। 'তত্ত্বমসি' অথবা 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক সত্য হল—আমি দেহমন দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্র সীমিত অস্তিত্ব মাত্র নই। আমার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা ব্যক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু তাহলে কেন আমি জানতে পারছি না যে, আমি অনন্ত, আমি সর্বজ্ঞ? আমি নিজেকে ক্ষুদ্র ও সীমিত বলে মনে করি, আমি ঘাড়ের ব্যথায় কষ্ট পাই, আমার নিজেকে অজ্ঞ, হতাশাগ্রস্ত বলে মনে হয়। তাহলে কী করে একথা বলছেন যে, আমি অনন্ত পরম সত্তা? নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ? নিত্য আনন্দস্বরূপ? স্বামীজীর ভাষায়—এর কারণ আমরা নিজেদের 'সম্মোহিত' করে রেখেছি। এ হল আত্মসম্মোহনের পরিণাম। কিন্তু আপনারা বলবেন যে, ''সত্য হল, আমি নিজেকে ক্ষুদ্র, অজ্ঞানী, হতাশাগ্রস্ত মনে করছি। এগুলি সবই আমার দৈনন্দিন অনুভূতির বিষয়। কিন্তু স্বামীজী, আপনি এমন কিছু উপদেশ দিচ্ছেন, যা আমাদের অনুভূতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে! তাহলে প্রকৃত সত্য কী? আমার অনুভূতি, নাকি আপনার উপদেশ? বোধ হচ্ছে, আপনিই এইসমস্ত বলে আমাদের সম্মোহিত করার চেষ্টা করছেন। একজন ডাক্তারও ঠিক এইভাবে বলেন, যখন আমি তাঁকে জানাই যে আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। তিনি পরামর্শ দেবেন, 'আপনি নিজেকে বলুন যে আপনি ক্লান্ত নন। তাতে দিনের পর দিন আপনি আরও সুস্থ বোধ করবেন।' স্বামীজী আপনার উপদেশও কি এই একই ধরনের আত্মসম্মোহন?''

স্বামীজীকেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি হেসে বলেছিলেন, ''হ্যাঁ, কিন্তু একমাত্র পার্থক্য হল, এটা অ-সম্মোহন। জন্ম জন্ম ধরে তোমাকে শেখানো হয়েছে যে, তুমি ক্ষুদ্র আর তুমি সেটা বিশ্বাস করে এসেছ। তাই তোমার মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুদ্র, অজ্ঞ, সীমিত, নির্বোধ, হতাশাগ্রস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেদান্ত বলছে, তুমি এই সীমিত অস্তিত্বমাত্র নও। অতএব বেদান্ত তোমাকে অ-সম্মোহিত করছে, কখনও সম্মোহিত করছে না। এই হল সমগ্র বৈদান্তিক প্রজ্ঞা এবং অ-সম্মোহনের বৈদান্তিক কৌশল। এর ফলস্বরূপ তুমি অনুভব করতে পার যে, তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীজীর চারটি বিখ্যাত সূত্রকে স্বামী তপস্যানন্দজী নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'নব-ব্রহ্মসূত্র' নাম দিয়ে।

প্রথম সূত্র—প্রত্যেক জীব স্বরূপত ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় সূত্র—বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করাই জীবনের লক্ষ্য।

তৃতীয় সূত্র—'কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযোগ, দার্শনিকতা—এর যে কোনও একটি, একের অধিক বা সবকটি পদ্ধতি দ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করো ও মুক্ত হও।

চতুর্থ, অর্থাৎ শেষ সূত্র হল—এই হল ধর্মের সারকথা—ধারণা, মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান অথবা পুঁথিপত্র, মন্দির, বিগ্রহ ইত্যাদি সবই ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র।

স্বামীজী বারবার বলেছেন, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে বলো যে, তুমি এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নও। নিজের প্রকৃত স্বরূপে আস্থা রাখো। রহস্যটি হল, যদি তুমি নিজের সত্তা সম্বন্ধিত সত্যের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে চলো, অন্তিমে সত্য আপনা থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করবে। বাইবেলে যিশুও বলেছেন, ''তোমরা সত্যকে জানো, সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে।'' মুক্তিলাভের জন্য বাইরে থেকে কোনওকিছু করার প্রয়োজন নেই। তোমাকে একমাত্র যেটা জানতে হবে, তা হল তুমি স্বরূপত দিব্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম। তুমি অনন্তকাল ধরে মুক্ত ছিলে, মুক্ত আছ এবং সর্বদা মুক্তই থাকবে। প্রশ্ন হল, আমি কেন কল্পনা করব যে, আমি ক্ষুদ্র হয়েই জন্মেছি? শুধুমাত্র এই কারণে যে, আমি একটি দেহ দ্বারা সীমাবদ্ধ! আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—''কেবলমাত্র আপনি বলছেন বলে, ঋষিরা বলে গেছেন বলে কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বলেই কি আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে?'' না, বেদান্ত বলছে, ঘরে বসে নিজের অনুভূতি বিশ্লেষণ করে দেখো। জাগ্রত অবস্থায় যে-জগৎ তুমি দেখছ, সেটাই তোমার অনুভব-বেদ্য। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, আপনারা শুনছেন। এই অনুভূতির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুমের মধ্যে আমরা নিজস্ব একটি জগৎ তৈরি করি। আপনারা প্রত্যেক দিনই কি সেটা করেন না? হ্যাঁ, আমরা সকলেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাদের নিজস্ব কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে থাকি। আমরা ওই জগতে বাস করি, ওখানে ঘুরে বেড়াই, এর ব্যতিক্রম কেউ নয়।

যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ও স্বপ্নে একটি জগৎ সৃষ্টি করি, তখন আমরা সৃষ্টিকর্তা হয়ে উঠি। মানব-চেতনার মহিমা উপলব্ধি করতে পারছেন তো? ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আর আমি অভিন্ন হয়ে যাই, কারণ স্বপ্নে আমিও আমার নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে পারি। আপনারা বলতে পারেন, ''ওঃ সেটা তো সত্যি নয়!'' কিন্তু এটাও (জাগ্রত অবস্থার জগৎ) যে সত্য, তা কেমন করে জানলেন? স্বপ্নে আপনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেন, এই দৃশ্যমান জগৎ কি তার চেয়ে বেশি সত্য?

একবার বার্ট্রান্ড রাসেল প্রশ্ন করেছিলেন—''যদি আমি দিনের মধ্যে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি আর ঠিক বারো ঘণ্টা জেগে থাকি, তাহলে কোন অবস্থাটা সত্য?'' আমরা কোনও কিছুকে অসত্য বলি, কারণ আমাদের কাছে অন্য আর একটি বিষয় বা অবস্থা সত্য বলে মনে হয়। আমরা এইরকম বলি, কারণ আমরা ওই অন্যটিকে সত্য বলে মানতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু কেন আমরা উলটোটা দেখি না? সুতরাং, আপনারা বুঝতে পারছেন, আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক। যখন আমরা সুষুপ্তিতে থাকি, তখন আমরা কিছুই দেখি না। একেবারে কিচ্ছু না। আমাদের কোনও বিষয়েরই কণামাত্র অনুভব হয় না। তখন কেউই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। সেখানে কোনও 'আমি' নেই, 'তুমি'ও নেই। কেবল থাকে সমরস চৈতন্য, যাতে 'আমি'-'তুমি' নেই। তবুও আমরা অত্যন্ত সুখ অনুভব করি। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সুখেই থাকি, তাই না? কেউ কি একথা বলে যে, সে ঘুমোবে না, কারণ ঘুমিয়ে পড়লেই

তার চেতনা লুপ্ত হবে? বরঞ্চ, আমরা মহানন্দে আমাদের 'আমিত্ব'কে হারাবার জন্য ঘুমিয়ে পড়তে চাই। আমরা জানি যে, এ এক মহা সুখানুভূতির অবস্থা। অতএব চেতনার এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে আমরা অত্যন্ত সুখ অনুভব করি, সমস্ত দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করি, কারণ 'আমি' বা 'তুমি' থাকে না, ভেদপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়।

অতএব বেদান্ত বলছে, নিজের অনুভূতি বিশ্লেষণ করো এবং অনুসন্ধান করো—কোনটি সত্য। বেদান্ত তিনটি অবস্থার কথা বলে—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই অবস্থাগুলি আসে-যায়, চক্রবৎ আবর্তিত হতে থাকে যা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি। কিন্তু এইসব অবস্থার মধ্যে একজন পরম 'আমি' থাকেন, এই তিন অবস্থার 'আমি'র সঙ্গে যাঁর কোনও সংযোগ নেই এবং সেই 'পরম আমি' বা সাক্ষী চৈতন্যের অনুমতিক্রমেই এই সমস্ত অবস্থাগুলি ঘটে চলেছে। এই বিষয়টি অনুভব করুন—এটাই বেদান্ত।

এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিমূর্ত বোধ হয়, কিন্তু বিবেকানন্দ এই বিমূর্ত সত্যকেই দৈনন্দিন জীবনে জীবন্ত ও কাব্যিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই 'পরম সত্য'কে কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে? খুবই সহজ সেটা। ধরে নিন, আপনি অফিসে বসে আছেন। একজন আপনাকে তিরস্কার করল। কী হয় তখন? আপনি মুষড়ে পড়েন। এই একই ঘটনা স্কুলে, কলেজে এবং অবশ্যই পরিবারে অথবা সম্ভবত সর্বত্রই ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই হতাশা বা দুঃখ বোধ করি। পরিবারে স্ত্রী দুঃখ পান, স্বামীও দুঃখ পান। তখন এই সত্য আমরা কেন প্রয়োগ করতে পারি না যে, এটি এমন একটি অনুভূতি যা চিরস্থায়ী নয় এবং যে-স্মৃতি বা অনুভূতি ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়, তাকে খুব গম্ভীরভাবে গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। যা কিছু স্থায়ী ও নিত্য, তাকে আমরা নিশ্চয় গম্ভীরভাবে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু যা আসে আবার চলে যায়, সেগুলি কেবল অস্থায়ী অভিজ্ঞতা মাত্র। সেগুলিকে কখনও গম্ভীরভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, যদিও সেইসময়ের জন্য বিশেষ কোনও কারণবশত আমরা কোনও ঘটনাকে গম্ভীর ভাবে গ্রহণ করতে পারি, পরে হয়তো একথা ভেবে আমাদের হাসি পায় যে, কত তুচ্ছ কারণে তখন রাগ হয়েছিল। নিজের ক্রোধের প্রতিক্রিয়া দেখে কখনও কি আপনার হাসি পেয়েছে? তার মানে, আগে ক্রোধ আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং কিছু সময় পরে আপনি সেই 'ক্রোধ'কে দেখছেন এবং রীতিমতো কৌতুক অনুভব করছেন। আমি আপনাদের একটি চলচ্চিত্র 'প্রিমিয়ার-শো'-এর উদাহরণ দেব, যেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গিয়ে তাঁদের নিজেদের অভিনীত ছবি দেখেন। মনে করুন, একজন অভিনেতা একটি অত্যন্ত করুণরসাত্মক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি ওই 'প্রিমিয়ার-শো' দেখতে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে কী করবেন? হয়তো তিনি আয়েস করে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবেন, আর হাসিমুখে বলবেন, ''আহা, ওই দৃশ্যে আমার অভিনয় সবথেকে ভাল হয়েছে!'' ছবিতে তাঁকে কাঁদতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু প্রদর্শনী কক্ষে বসে তিনি হাসছেন, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন আর নিজের অভিনয় উপভোগ করছেন!

বেদান্ত বলে, তুমিও এমন করতে পার আর এখনই তাই করো। আমি নিজেকে ক্রুদ্ধ হতে দেখতে পারি, বিচলিত হতে দেখতে পারি, আপনি নিজেকে খুশি হতে দেখতে পারেন, বিষণ্ণ হতে দেখতে পারেন। খেলতে থাকুন, বা বলা ভাল, খেলায় অংশগ্রহণ না করেই খেলুন। খেলাটা চালিয়ে যান। আপনিই সেই পর্দা যেখানে খেলাটা চলছে। মনে করুন, একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য

পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনি কী করবেন? আপনি কি দমকল বাহিনীকে খবর দেবেন, নাকি জলের বালতি নিয়ে আগুন নেভাতে ছুটবেন? অথবা ধরুন, পর্দায় একটি বন্যার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। আপনি কি জল বের করে দেওয়ার জন্য জলনিকাশি বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে ডাকবেন? না। যে-মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠবে, আপনি দেখতে পাবেন সাদা পর্দা—যা জ্বলেও যায়নি, ভিজেও যায়নি। এই কারণেই মহান বেদান্ত-শাস্ত্র গীতার নির্ঘোষ (২।২৩-২৪) : ''নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।/ ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥/ অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।/ নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥''

এগুলি কাল্পনিক বা মিথ্যা স্তোকবাক্য নয়। এই আত্মাকে তরবারি দ্বারা কেটে ফেলা যায় না, জল একে ভেজাতে পারে না, অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না। এই আত্মা নিত্য, শাশ্বত, অনন্ত, অমর। তুমিই সেই আত্মা। এই সত্যকে ধারণা করুন। আত্মা বিষয়ে কেবল চিন্তামাত্রও আমাদের উন্নত করে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এও এক ধরনের সম্মোহন, তবুও আমাদের এর চর্চা করা উচিত যেহেতু তা আমাদের উন্নত করে। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে এর চর্চা করি না। আমরা খাওয়া-দাওয়া উপভোগ করতে চাই, সিনেমা উপভোগ করতে চাই, প্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক দেখে আরাম করতে চাই। স্বাদবদলের জন্য আমরা কি বেদান্তের মধ্যে আরাম খুঁজে নিতে পারি না? যদি আরাম করার জন্যও তা করা হয়, তা হবে অত্যন্ত পরিশুদ্ধ ও উন্নত ধরনের একটি আরাম উপভোগ। যেহেতু এর ভিত্তি হল 'সত্য', তার প্রভাব হবে চিরন্তন।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''দিবারাত্রি শুনতে থাক—তুমিই সেই পরমাত্মা। বারবার দিবারাত্রি নিজেকে একথা বলতে থাক, যতক্ষণ না তা তোমার প্রতিটি শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হয়, যতক্ষণ না তা তোমার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতক্ষণ না তা তোমার অস্থিমজ্জার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ না হয়ে ওঠে। সমগ্র শরীর হয়ে উঠুক সেই এক আদর্শে পরিপূর্ণ—আমি জন্মহীন, মৃত্যুহীন, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, চির-মহিমান্বিত আত্মা। দিবারাত্রি এই বিষয়ে চিন্তা করো। চিন্তা করতে থাকো, যতক্ষণ না এই আদর্শ তোমার জীবনযাত্রার এক অভিন্ন অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে ধ্যান করো। এইভাবেই আদর্শ কর্মে পরিণত হবে।''

বাক্যটি লক্ষ করুন! ভাববেন না যে, আপনার বর্তমান কর্মটি থাকবে না বা আপনাকে কর্ম থেকে পদত্যাগ করতে হবে। আপনার সাংসারিক জীবন মুছে যাবে—এমনটা ভাবারও কোনও কারণ নেই। ভাববেন না যে এই বেদান্তবাণী আপনাকে সম্পূর্ণভাবে একজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তিতে পরিণত করে দেবে কিংবা আপনি আর স্বাভাবিক সংসারজীবনে প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনি যা করছিলেন, সেই সমস্তই করতে পারেন। তফাত হবে একটাই—এরপর থেকে আপনি যাই করবেন, চমৎকারভাবে করবেন, কারণ আপনি আসক্ত হবেন না। এই অবস্থায়, কেউ যদি এসে আপনাকে ভর্ৎসনা করে, অথবা অযৌক্তিক কোনও কথা বলে, আপনি মজা পাবেন। কারণ আপনার নিজেকে অপমানিত বোধ হবে না। আত্মাকে কেউ অপমান করতে পারে কি? সেটাই হবে আপনার মনোভাব। এখানে তৈত্তিরীয় উপনিষদের অংশবিশেষ (১।১০) উদ্ধৃত করে বলব, যেখানে ঋষি ত্রিশংকু বলছেন—ওই সুউচ্চ পর্বত-তুল্য বিশাল আমার মহিমা।' ''অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।''

অর্থাৎ কে আমার কী ক্ষতি করতে পারে? মনে

করুন, আপনি সমুদ্রের কাছে গেলেন। বললেন, ''ওহে, আমি তোমাকে পছন্দ করি না'' আর কিছুটা নোংরা জল সমুদ্রে ঢেলে দিলেন। সমুদ্র কী করবে? সমুদ্র শুধু হাসবে, সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, আবার গর্জন করতে থাকবে। আমরা কি এরকম করতে পারি না? আমরা মনে করি, এই আদর্শ আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। নিশ্চয়, আমরা জানি যে, বেদান্ত যে-আদর্শের কথা বলে, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানবপ্রকৃতিতে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একটি হল, জীবনের সঙ্গে আদর্শের সংগতিস্থাপন বা মেলবন্ধন এবং অন্যটি হল, জীবনযাপনকে আদর্শের সমস্তরে উন্নীত করে তোলা। এটি স্বামীজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই দুই প্রবণতা থাকে। একটি, আদর্শকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। অর্থাৎ, কোনও না কোনওভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বা সমঝোতা করে আমাদের জীবন এমনভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করি, যাতে কল্পনা করে নিতে পারি যেন আমাদের জীবনে আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি। অন্যটি হল, জীবনকে আদর্শের স্তরে উন্নীত করা। এর অর্থ হল, তখন আমি দিব্যসত্তার খোঁজ করি। যদি আমি জন্মমৃত্যুহীন হই, যদি আমি নিত্য, শাশ্বত ও অমর হই, তাহলে দৈনন্দিন জীবনে আমাকে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন সেই আদর্শ আমার প্রত্যেক কাজে প্রতিফলিত হয়।

একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসি-সন্তান ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দজী। তিনি কৈশোর থেকেই বেদান্তচর্চা করতেন এবং জীবনের প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে এই আদর্শকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন। একদিন তিনি গঙ্গাস্নানে গেলেন। হঠাৎ একটা কুমির দেখে তিনি প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি নিজেকে বোঝালেন, ''না, আমি দিব্য সত্তার অধিকারী, আমি ভয়শূন্য ও মৃত্যুহীন। আমি একটা কুমির দেখে কেন ভয় পাব?'' কিন্তু তারপরেও তিনি দ্রুত নিজের স্নান সেরে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই হল মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা! তখন তিনি নিজের কর্মের পুনর্বিবেচনা করলেন ও চিন্তা করলেন—''আমি কেন দ্রুত স্নান সেরে নেওয়ার চেষ্টা করছি? আমি যেমন রোজ স্নান করি, সেইভাবেই করব, আজ আমি ভয়কে জয় করব।''

আর একটি উদাহরণ দেব স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজের (ভরত মহারাজ) জীবনের একটি ঘটনা থেকে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় তাঁর নাম শুনেছেন এবং কারও কারও তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্যও হয়েছে। আমাদেরও তাঁর পদপ্রান্তে বসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি তাঁর জীবনের এমন একটি ঘটনা বলব, যেটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বামী অশোকানন্দ ছিলেন স্বামী অভয়ানন্দের প্রিয় বন্ধু। সিস্টার গার্গী (মারি লুই বার্ক) স্বামী অশোকানন্দের জীবনীতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। স্বামী অভয়ানন্দ ঘটনাটি স্বামী অশোকানন্দকে নিজমুখে বলেছিলেন এবং পরে তিনি আবার সিস্টার গার্গীকে বলেছিলেন। গার্গীর বর্ণনা অনুযায়ী, একবার স্বামী অভয়ানন্দ আর-একজনের সঙ্গে মায়াবতীর জঙ্গলে ঘুরছিলেন। সেই সময়ে ওইসমস্ত স্থানে ঘন জঙ্গল ছিল। হঠাৎ অভয়ানন্দজী দেখলেন একটি বিরাট বড় বাঘ তাঁদের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে। জোরালো টর্চের আলোর মতো বাঘের চোখদুটো জ্বলছিল। অভয়ানন্দজী নিশ্চলভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, সেই ভয়ংকর হিংস্র জানোয়ারের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকলেন তিনি। কারণ তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী, অদ্বৈত অনুশীলন করতেন, আমাদের মতো তাত্ত্বিক অনুশীলন তা ছিল না। আমি এতকিছু বলছি, কিন্তু একটি বিষধর কোবরা

যদি আমার সামনে উপস্থিত হয়—আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাব! যখনই আমরা ঘরে-বাইরে সামান্যতম সমস্যার সম্মুখীন হই, তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করি। কিন্তু স্বামী অভয়ানন্দ নিজেকে স্মরণ করালেন—''আমি যদি অমর-আত্মা হয়ে থাকি, আমি অভীঃ, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র—নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব—বাঘটাও ওই একই উপাদানে তৈরি। একই আত্মা সর্বত্র বিরাজমান!''

সুতরাং তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বাঘটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পরিস্থিতিটা একবার চিন্তা করুন! সেই গভীর জঙ্গলে অভয়ানন্দ একটি বাঘের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর বাঘটাও তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে! আপনারা জানেন, তারপর তিনি কী করলেন? তিনি নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন, তাঁর হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুততর গতিতে স্পন্দিত হচ্ছে কি না! তিনি নিজের জামার ভিতরে বুকের উপর হাত রেখে কয়েক মিনিট নিজের হৃৎস্পন্দন অনুভব করলেন। না, হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক গতিতেই স্পন্দিত হচ্ছে। অতএব, বুঝলেন তো, তিনি সত্যই ছিলেন অভয়ানন্দ। তিনি প্রকৃতই ভয়কে জয় করেছিলেন।

কীভাবে এটি সম্ভব হল? এটি সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি নিজের জীবনকে আদর্শের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। এটি একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় যে, অন্য প্রবণতাটি অর্থাৎ আদর্শকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া—সে হল আমাদের জীবনের নানাবিধ প্রলোভন। কারণ আদর্শকে জীবনযাত্রার ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার অর্থ হল প্রতিক্ষেত্রে অনিঃশেষ সমঝোতা করে চলা। স্বামীজী বুদ্ধের কথা বলতেন। বুদ্ধদেব যখন বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে বসলেন, 'মার' এসে সর্বপ্রকারে তাঁকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তিনি সমস্ত প্রলোভন জয় করলেন। সেই মিথ্যা চাতুরির জগতে, যেখানে ভুল নামে বস্তুর পরিচয় হয়, যেখানে অবিরাম মিথ্যা বলতে হয় নিজের ও অপরের কাছে—সেই জগতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান বুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি সংসারে প্রত্যাবর্তন করলেন না, তাই অবশেষে তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন। বোধিলাভ করে 'বুদ্ধ' হলেন।

আমাদেরও এই সমঝোতা করে চলা, এই আপস করে চলাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং জীবনকে উন্নীত করতে হবে আদর্শের স্তরে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হল ঈশ্বরজ্ঞানে অপরের সঙ্গে আচরণ করা। কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা এবং কোনওভাবে আঘাত করা উচিত নয়। এ কেবল সন্ন্যাসীদের পালনীয় নয়, সমগ্র মানবজাতির কর্তব্য। আমি যদি নিজেকে ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর বলে মনে করি, তাহলে তুমিও তাই। তুমিও ঈশ্বর, তুমি শয়তান হতে পার না। একজন ঈশ্বর অপর ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরতুল্য আচরণ করবেন। তাহলে সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মনোভাব পরিবর্তিত হবে। আমাদের দৈনন্দিন কর্মও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটি চেষ্টা করে দেখুন এবং দেখুন কীভাবে সবকিছু বদলে যায়।

বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলছি, এই বৈদান্তিক সত্য পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হয়েছে, প্রমাণিত হয়েছে, নথিভুক্ত হয়েছে এবং আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এই আদর্শের আলোকে জীবনযাপন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। এখন স্বামী বিবেকানন্দ এসে এই প্রাচীন পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, কেবলমাত্র হিমালয়ের গুহায় বসে নয়—কলকাতা, চেন্নাই, টোকিও কিংবা নিউইয়র্কের মতো আধুনিক ও ব্যস্ততম শহরেও বেদান্ত আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বালোকে আধুনিক মানুষেরও জীবনযাত্রা উজ্জ্বল, পবিত্র ও দিব্য হয়ে উঠতে পারে।